প্রথম আলো
অনলাইন সংস্করণ

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস: দেশপ্রেমের প্রথম পাঠ

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

আলফ্রেড নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কার করেছিলেন। ডিনামাইটের মতো বিস্ফোরক আর কয়টা আছে? তাই তার ব্যবসা করে আলফ্রেড নোবেল অনেক টাকা-পয়সা কামাই করেছিলেন। শেষ বয়সে তার মনে হলো যুদ্ধ-বিগ্রহে ডিনামাইট ব্যবহার করে কত হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, তার মৃত্যুর পর পৃথিবীর মানুষ তো তাকে এই ভয়াবহ মানববিধ্বংসী বিস্ফোরকের আবিষ্কারক হিসেবেই মনে রাখবে, কাজটি কি ভালো হলো? এ রকম একটা গ্লানি থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য আলফ্রেড নোবেল তার অঢেল সম্পদকে ব্যবহার করে মৃত্যুর আগে নোবেল পুরস্কার নামে একটা পুরস্কারের ব্যবস্থা করে গেলেন। তার ধারণা সঠিক ছিল–এখন নোবেল কথাটা শুনলে কেউ ভুলেও ডিনামাইট, বোমা, মৃত্যু বা হত্যাযজ্ঞের কথা মনে করে না। সবাই এখন নোবেল শব্দটার সঙ্গে যুক্ত করে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মননশীল মানুষদের–বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, অর্থনীতিবিদ কিংবা সমাজসংস্কারকদের। সারা পৃথিবী খুঁজে একেবারে হাতেগোনা দুয়েকজনকে এই বিরল সম্মানের পুরস্কারটি দেওয়া হয় বলে পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ এই পুরস্কার বা এই পুরস্কার পাওয়া মানুষদের ধারে-কাছে আসতে পারে না। তাই ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনে আমি যখন আমাদের একজন প্রফেসরকে আবিষ্কার করলাম, যে প্রতিবছর অক্টোবর মাসে তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়নি বলে খুব তিরিক্ষি মেজাজে থাকতেন–আমি এক ধরনের কৌতুক অনুভব করেছিলাম! প্রফেসরের নাম হান্স ডেহমলেট, তাঁর ছিল মাথাভরা টাক এবং বিশাল জুলফি। পূর্ব ইউরোপের কোনো দেশ থেকে এসেছিলেন বলে ইংরেজি উচ্চারণ ছিল খুব মজার। তাঁর একটা কোর্স করার পর তিনি আমার ওপর খুব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে কাজ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। প্রতি অক্টোবরে যে মানুষের মেজাজ গরম হয়ে যায় তাঁর সঙ্গে কাজ করার আমার সাহস নেই–আমি সবিনয়ে তাঁর আমন্ত্রণটি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। মজার ব্যাপার হলো, তার কয়েক বছর পর সত্যি সত্যি হান্স ডেহমলেট নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন! প্রফেসর হান্স ডেহমলেটকে দেখে আমি অক্টোবর মাসে মেজাজ গরম করার বিষয়টি জানতে পেরেছিলাম। বছর পনেরো আগে আমি যখন প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংকের কথাটা জানতে পেরেছিলাম তখন থেকেই আমি মনে মনে আশা করেছিলাম যে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়ে যাবেন। আমি আমার কোনো একটি বইয়ে এই বিষয়টি লিখেছিলাম এবং সেই বই পড়ে অনেক মানুষ আমার সঙ্গে সঙ্গে অক্টোবর মাসে মেজাজ গরম করতে লাগল। গত পরশু দুপুরে আমার এক যুগ থেকে বেশি সময়ের অপেক্ষা শেষ হয়েছে! আমি বলতে গেলে টেলিভিশন দেখিই না, অথচ ঠিক যখন নোবেল পুরস্কারের ঘোষণাটি দেওয়া হচ্ছে আমি তখন ঘটনাক্রমে টেলিভিশনের সামনে। এ রকম একটি ঘোষণা কেমন করে দেয় সেটি নিজের চোখে দেখে, নিজের কানে শুনে আমি বহু দিন পরে একেবারে বাচ্চাদের মতো চিৎকার করে ছুটে বেড়িয়েছি! এত আনন্দ কোথায় রাখব, কাকে দেব বুঝে উঠতে পারছিলাম না!

পশ্চিমা কালচারে ধরে নেওয়া হয় ১৩ তারিখটা খুব অশুভ আর সেই তারিখটা যদি হয় শুক্রবারে তাহলে তো কথাই নেই। 'ফ্রাইডে দ্য থার্টিনথ' নামে সেই দেশে ভয়ঙ্কর সব ভয়ের ছবি তৈরি হয়–সেই অশুভ ভয়ের দিনটি আমাদের জন্য কত আনন্দ নিয়ে এসেছে কেউ কোনোদিন কল্পনা করতে পারবে?

২.
আমরা বাঙালিরা হইচই করতে খুব পছন্দ করি। ছোটখাটো ঘটনাতেই আমরা রাস্তায় নেমে পড়ি, রঙ খেলায় মেতে উঠি। প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মতো এত বড় ঘটনার পর আমরা যে আনন্দের আতিশয্যে কী করব বুঝতে পারব না সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। গত কয়েক দিন পত্রপত্রিকা ইউনূসে ইউনূসময়। শুধু যে খবর, ফিচার, আলোচনা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস নিয়ে তা নয় পৃষ্ঠাজোড়া বিজ্ঞাপনগুলো পর্যন্ত প্রফেসর মহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে। টেলিভিশনে তাঁর ওপর আলোচনা হচ্ছে, তাঁকে নিয়ে অনুষ্ঠানমালা প্রচারিত হচ্ছে। তাঁর সাক্ষাৎকার, তাঁকে নিয়ে গুণীজনদের আলোচনা এবং প্রতিক্রিয়া দেখানো হচ্ছে। এ রকম একটা সময়ে আমি প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে একটিও নতুন কথা বলতে পারব বলে মনে হয় না। এতক্ষণে তিনি কোন টুথপেস্ট ব্যবহার করেন কিংবা তার ফতুয়াটা কোন দোকান থেকে কেনেন–সেটাও নিশ্চয়ই দেশের সবাই জেনে গেছে!

আমি তাঁর একজন খুব বড় ভক্ত। বাংলাদেশের যেসব মানুষ বিদেশে থাকেন তারা সবাই জানেন সেটি কত কষ্টের–বাংলাদেশ সম্পর্কে সেখানে কখনো একটিও ভালো কথা ছাপা হয় না। ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে দেশে চলে এসে আমি সেই যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পেয়েছি, কিন্তু এখনো যারা বিদেশে রয়ে গেছেন তাদের সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি নেই। গত এক যুগে অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে, আমাদের দেশে জঙ্গিবাহিনীর জন্ম হয়েছে, হাওয়া ভবন তৈরি হয়েছে, র‍্যাব দিয়ে ক্রসফায়ার শুরু হয়েছে, গ্রেনেড হামলার প্রচলন হয়েছে। এখন যারা বিদেশে থাকেন তাদের অবস্থা চিন্তা করে আমি তাদের জন্য করুণা অনুভব করি। এক যুগ আগে আমি যখন দেশের বাইরে ছিলাম আমাদের দেশ নিয়ে যেটুকু ভালো কিছু বলা হতো সেটা ছিল প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস আর তার গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ে। আমার ধারণা, সেই অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। বিদেশের মাটিতে আমাদের দেশকে নিয়ে গর্ব করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না। '৯২ সালে একবার দেশে এসে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। এ রকম ঝকঝকে পরিষ্কার চিন্তার মানুষটিকে দেখে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাই এবং এখনো মুগ্ধ হয়ে আছি। তাঁর যে জিনিসটা আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে সেটা হচ্ছে দেশের জন্য তীব্র মমত্ববোধ। মনে আছে, কয়েক বছর আগে একবার আমাদের ধারণা হলো দেশে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ঘটানোর জন্য প্রবাসী বাঙালিদের এর মধ্যে সম্পৃক্ত করা দরকার। কাজটা সবচেয়ে ভালোভাবে করা যায় আমেরিকা গিয়ে প্রবাসী পেশাজীবীদের সরাসরি সেটা বলতে পারলে। কথাটা অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয় যদি সেটা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের মুখ দিয়ে বলানো যায়। তাই আমরা গিয়ে একদিন প্রফেসর ইউনূসকে অনুরোধ করলাম আমেরিকা যেতে। তিনি এককথায় রাজি হয়ে গিয়ে আমাকে বললেন, 'তোমাদের যদি মনে হয় আমাকে নিয়ে গেলে তোমাদের কাজ হবে, আমি তাহলে অবশ্যই যাব!' আমরা এখন সবাই জানি সারা পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রনায়ক পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে কিংবা কথা বলতে সুযোগ পান না। এ রকম একটা ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমাদের সঙ্গে আমেরিকায় আটলান্টিক সিটিতে গিয়ে সেই কনভেনশনে যোগ দিলেন, শুধু যে যোগ দিলেন তা নয় সেখানে সময় দিলেন, সবার সঙ্গে কথা বললেন। আমি নিশ্চিত আমার যে রকম এই একটা অভিজ্ঞতা আছে, এ দেশের আরও অসংখ্য মানুষের ঠিক সেরকম অসংখ্য অভিজ্ঞতা রয়েছে!

আমি যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে সময় কাটাতে হয় এবং সে কারণে অবধারিতভাবে পৃথিবীর যাবতীয় জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ ব্যাংকেরও সমালোচনা শুনতে হয়। সেসব সমালোচনা সাধারণত আমি এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করে দিয়েছি–তার কারণ একটিই; প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের যে বিশ্বাসটুকু এই ব্যাংকের জন্ম দিয়েছে সেটি যদি সত্যি না হতো তাহলে কোনোভাবেই গ্রামীণ ব্যাংক এভাবে বিকশিত হতো না! এই

দেশের একেবারে হতদরিদ্র মানুষেরা এটি গ্রহণ করেছে, তারা তো কোনো তত্ত্ব কথা পড়ে আসেনি; তারা এসেছে নিজের জীবনের একটু পরিবর্তন আনতে। যদি সেই পরিবর্তনটুকু তারা না আনতে পারে তাহলে কেন তারা এই ব্যাংকটিকে এভাবে বিকশিত হতে দিয়েছে? তারা যদি খুশি থাকে তাহলে আমি কেন বেজার থাকব?

সত্যি কথা বলতে কী প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস সারা পৃথিবীকে একটা জিনিস শিখিয়েছেন, সেটা হচ্ছে মানুষকে বিশ্বাস করা। একজন মানুষের বুকের ভেতর মনুষত্বের সলতেটুকু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জ্বলতে থাকে সেটাকে স্পর্শ করলে সেটা যে আরও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে শুরু করে–এই সত্যটুকু তাঁর মতো করে পৃথিবীকে কি আর কেউ দেখিয়েছেন?

৩.

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কারণে আমার আনন্দের সম্পূর্ণ একটা ভিন্নমাত্রা রয়েছে। এই দেশের অসংখ্য শিশু-কিশোর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে বলছে, 'স্যার এবারে আমাদের পদার্থবিজ্ঞানেও নোবেল পুরস্কার পেতে হবে! রসায়নেও পেতে হবে।' বর্তমান বিজ্ঞান কোন পর্যায়ে গেছে–সে সম্পর্কে এই শিশু-কিশোরদের কোনো ধারণা নেই, বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার কারা পাচ্ছেন সেটা একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে; সেটা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে একেবারে আধুনিকতম ল্যাবরেটরিগুলোর আশপাশে। তত্ত্বীয় আর ব্যবহারিক জ্ঞান এখন হাতে হাত ধরে এগিয়ে যায়, একা অগ্রসর হতে পারে না। আমাদের দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এত খুঁটিনাটি বাস্তবতা নিয়ে মাথা ঘামায় না, তারা সজোরে ঘোষণা করে বসে থাকে এখন আমাদের পদার্থবিজ্ঞানে কিংবা রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেতে হবে! এই বিশাল আত্মবিশ্বাস আর অনুপ্রেরণাটুকু আমরা কি কখনো আমাদের সন্তানদের দিতে পেরেছি? এই দেশের ছেলেমেয়েরা নিজের চোখে দেখেছে, এই দেশের মাটিতে জন্ম নেওয়া একজন মানুষ এই দেশের মাটিতে কাজ করে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানটুকু অর্জন করেছেন, তাহলে তারা কেন এ রকম অসাধ্য সাধন করতে পারবে না?

গত কয়েক দিন যার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে হাত ধরে তাকে বলেছি, 'অভিনন্দন'; সে আমার হাত ধরে বলেছে, 'অভিনন্দন'। প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস এই বিরল সম্মানটুকু আমাদের জন্য এনেছেন আর কী অনায়াসে সেটা আমরা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করে ফেলেছি! মনে হচ্ছে তিনি একা নন, আমরাও বুঝি সেই সম্মানটুকু অর্জন করে ফেলেছি, আমাদের মাথা বুঝি আকাশ-ছোঁয়া হয়ে উঠে যাচ্ছে। আমাদের ভেতরে এত আত্মবিশ্বাসের জন্ম কি কেউ আগে দিয়েছিল?

৪.

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস তাঁর নোবেল পুরস্কারটি আধা-আধি ভাগ করে নিয়েছেন গ্রামীণ ব্যাংকের সঙ্গে। এই গ্রামীণ ব্যাংকটি বিস্ময়কর একটি ব্যাংক, কারণ এর ৯৫ শতাংশই হচ্ছেন নারী। আমাদের দেশের দুস্থ নারীরা অনেকে হয়তো জানেনই না যে তারাও নোবেল পুরস্কার পেয়ে বসে আছেন! আমার মনে হয় শুধু বাংলাদেশের নারীরা নয়, সারা পৃথিবীর মহিলাদের জন্য এটি বিশাল একটি বিজয়।

৫.

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের জীবনের নানা সাফল্য, নানা ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে এখন চারদিকে আলোচনা হচ্ছে। যারা সেগুলো পড়েছে তারা সবাই জানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী তাঁর প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংক একদিনে গড়ে ওঠেনি। তাঁকে তার পেছনে লেগে থাকতে হয়েছে, নানাভাবে চেষ্টা করতে হয়েছে, অসংখ্য উপায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়েছে। আমাদের স্কুলের ছোট ছেলেমেয়েদের বইয়ের

পাঠ্যসূচিতে তাঁর জীবনীটুকু রাখা উচিত এই একটি কারণে, কোনোকিছু অর্জন করতে হলে একজনকে কীভাবে তার জন্য কষ্ট করতে হয় সেটা বোঝার জন্য।

স্কুলের বইয়ে তাঁর জীবনীটুকু তুলে ধরলে সেখানে নিশ্চয়ই আরও একটা বিষয় থাকবে, সেটা হচ্ছে একাত্তর সালে তাঁর অসাধারণ একটি ভূমিকা। গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ে অভূতপূর্ব সাফল্যের কাহিনীর কারণে অনেক সময়েই তাঁর সেই ভূমিকাটুকুর কথা অনেকেই সেভাবে জানেন না। আমরা এখন জানি 'দোর্দণ্ড প্রতাপ' পাকিস্তান সেনাবাহিনী নয় মাসের ভেতর তাদের লেজ গুটিয়ে এই দেশে আত্মসমর্পণ করেছিল। একাত্তর সালে যখন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় তখন কিন্তু কেউ সেটা জানত না। একজন যখন মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন তারা কিন্তু ভবিষ্যতের দীর্ঘ এক অনিশ্চিত জীবনে নিজের পুরো জীবনটুকু উৎসর্গ করেছিলেন। প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস তখন আমেরিকায় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য কাজ করেছিলেন। যারা তখন তাঁর পাশাপাশি কাজ করেছেন আমি তাদের কাছে গল্প শুনেছি, সেগুলো অবিশ্বাস্য এক ধরনের গল্প। দেশের জন্য ভালোবাসায় একজন কীভাবে তার সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে দিতে পারেন সেটি হচ্ছে তার অভূতপূর্ব একটি ইতিহাস। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি দেরি করেননি, সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফিরে এসেছেন। যে বিশাল আত্মত্যাগ করে এই দেশের জন্ম হয়েছে তিনি সেটা কখনো ভুলেননি, তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ তিনি এই দেশের জন্য ঢেলে দিয়েছেন। এখন তিনি আর শুধু আমাদের নন, তিনি এখন সারা পৃথিবীর, কিন্তু তাঁর ওপর আমাদের অধিকারটুকু সবার আগে। এই দেশকে নিয়ে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস সব সময় স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর সেই স্বপ্ন এই দেশের সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে গেছে, তারাও সেই স্বপ্ন দেখেছে। দেশের দুঃসময়ে তিনি দূরে দাঁড়িয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলেননি, কিছু একটা করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। মুখে বড় বড় কথা বলা খুব সহজ, কিন্তু কিছু একটা করা সহজ নয় তারপরও সেটা করেই দেখাতে হয়, আমরা সেটা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে শিখেছি।

আমাদের খুব সৌভাগ্য, আমাদের সামনে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস আছেন। নতুন প্রজন্মকে স্বপ্ন দেখানোর জন্য সামনে কাউকে থাকতে হয় আর তাদের সামনে যিনি আছেন তিনি সারা পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে সফল মানুষদের একজন। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর সেই সাফল্যের পেছনে রয়েছে এই দেশের জন্য আর এই দেশের মানুষের জন্য গভীর ভালোবাসা।

আমাদের খুব সৌভাগ্য, আমাদের নতুন প্রজন্ম দেশকে ভালোবাসার প্রথম পাঠটি প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের মতো একজন মানুষের কাছ থেকেই নিতে পারবে।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল: লেখক। অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।